

রাষ্ট্র যখন পাশে দাঁড়ায়

করোনা বিপর্যয়ে সারা পৃথিবী জুড়েই স্বাস্থ্য সংকটের পাশাপাশি একটা বিরাট অর্থনৈতিক সংকট তৈরী হয়েছে। সেই সংকটের মূল কারণ হচ্ছে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ভাটা পড়ার ফলে কর্মী ছাটাই, লকডাউনের ফলে দিনমজুরদের কাজের অভাব। এদের জন্য করোনার স্বাস্থ্য সংকট যত না কঠিন তাঁর চেয়ে অনেক বেশী কঠিন প্রাত্যহিক জীবন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাস্তবতা, সোজা কথায় ক্ষুধার করাল গ্রাস।

এইরকম পরিস্থিতির শিকার একজন কারো কথা ভাবি যার করোনাতে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই বেলা খাবার যোগাড় করা মুশকিল হয়ে গেছে। তখন রাষ্ট্র যদি সেই ব্যক্তির পাশে এইভাবে এসে দাঁড়ায় তাহলে কেমন হয়?

এই ভয়াবহ সংকটে রাষ্ট্রের সাহায্য পেতে গেলে ওই ব্যক্তিটিকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে ব্যক্তিটিকে শুধু একটি বিশেষ নম্বরে জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বরসহ এসএমএস পাঠাতে হবে। তিনি সরকারী সাহায্য পাবেন কি পাবেন না সেটি এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারবেন শীঘ্রই।

ওই ক্ষুদ্রে বার্তাটি প্রেরণের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছু তথ্য যাচাই বাছাই হয়। যেমন তিনি গত ছয় মাসের মধ্যে বিদেশে ভ্রমণ করেছেন নাকি, তাঁর কোন যানবাহন আছে নাকি, বিভিন্ন বিল, তিনি সরকারী চাকুরে কিনা এইসব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহায্য পাওয়ার সক্ষমতা যাচাই করা হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল হওয়ার কারণে প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হতে থাকে।

যদি তিনি যোগ্য হোন তাহলে তিনি একটি ফিরতি ক্ষুদ্রে বার্তায় শুভ সংবাদটি পাবেন। তখন তাঁকে নিকটস্থ বায়োমেট্রিক এটিএম সেন্টার থেকে টাকা তুলতে হবে। বায়োমেট্রিক পদ্ধতি হওয়ার কারণে তিনি ছাড়া আর অন্য কেউ তুলতে পারবে না।

এই পর্যন্ত পড়ে হয়তো পাঠকের মনে হতে পারে এটি উন্নত বিশ্বের কোন দেশ। ব্যাপারটি তা নয়। যাই হোক সে প্রসঙ্গে আসছি একটু পরেই।

একটা কল্যানমুখী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হইলো সেই দেশের দরিদ্র, দুঃস্থ আর অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। যেই রাষ্ট্র সেই কাজটি যত ভালো ভাবে করতে পারে সেই রাষ্ট্রকে আমরা ততই কল্যানমুখী বলি। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর কাজটি মূলত করা হয় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে।

গত বছরের মার্চে যখন লকডাউন শুরু করে তখন করোনা সম্বন্ধে কারো কোন ধারণা ছিলো না যে এর ব্যাপ্তি কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে। লকডাউন আর বিভিন্ন বিধি নিষেধের কারণ অনেক ব্যবসা বন্ধ অথবা কার্যক্রম সীমিত হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকুরী হারিয়ে ফেলে। তখন এই সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রকমের কার্যক্রম হাতে নেয়। কোভিড-১৯ মহামারীতে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয় সম্প্রতি বিশ্বব্যাপক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে মূলত চারটি দেশের কথা বলা হয়েছে যারা সবচেয়ে বেশী সাফল্য দেখিয়েছে।

শুরুতে যেই প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া হলো সেটি এই চারটি দেশের একটির মধ্যে হয়েছে। এই দেশটি হলো পাকিস্তান যাকে প্রায়শই ব্যর্থ রাষ্ট্রের তকমা দেয়া হয়। এই তথাকথিত ব্যর্থ রাষ্ট্র কি করে একটা মারাত্মক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পৃথিবীতে গড়ে তুললো সেটা একটা বিস্ময়ের বিষয় বই কি।

পাকিস্তানের অর্থনীতি একটা লম্বা সময় ধরেই ভালো যাচ্ছিলো না। অবস্থা এমনই খারাপ হয় যে ২০১৮তে পাকিস্তানকে আইএমএফর দ্বারস্থ হতে হয় ঋণের জন্য। একটি হিসেবে দেখা যায় যে প্রায় ৮০ লক্ষ লোক দারিদ্র সীমার নীচে নেমে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। মূল্যস্ফীতি ১৩ ভাগ পর্যন্ত পৌছে যায়। জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৫.৮% থেকে ৩.৩% এ নেমে আসে।

এই রকম পরিস্থিতিতে ২০১৮ সালের জুলাইয়ে পাকিস্তানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন জনপ্রিয় ক্রিকেটার ইমরানের খানের নেতৃত্বে তেহেরিক ই ইনসাফ প্রথম বারের মতন ক্ষমতায় আসে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার পরে ইমরান খান তাঁর প্রথম ভাষণেই একটি কল্যানমুখী রাষ্ট্রের কথা গড়ে তোলার কথা বলেন যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা হবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি অন্যতম কার্যক্রম।

সেই অঙ্গীকার থেকেই ২০১৯ এর মার্চ থেকে এহসাস এর কার্যক্রম শুরু হয়। দারিদ্রতা দূরীকরণের যত রকম কার্যক্রম বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল সেগুলোকে একটা ছাতার নীচে এনে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

পুরো প্রক্রিয়াটির দায়িত্বে ছিলেন সানিয়া নিশাত যিনি পেশায় একজন ডাক্তার। এছাড়াও তিনি একজন আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর ইউ এন এর বিভিন্ন কমিটিতে ছিলেন।

সানিয়া দায়িত্ব নেয়ার শুরুতেই পরিষ্কার জানতেন যে তিনি কি চান। সেটি তিনি এক বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলেছেনঃ এহসাস হচ্ছে একটা মঙ্গলময় রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য একটি কার্যক্রম যার মাধ্যমে পাকিস্তান দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে একবিংশ শতাব্দীর কারিগরী বিদ্যা ব্যবহার করে।

২০১৯ এর পুরোটা পার হলো এইসব প্রস্তুতি নিয়ে, ২০২০ এর শুরুতেও সেইসব কার্যক্রমই চলছিল। কিন্তু এর মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন এসে গেলো করোনা। আগেই বলা হয়েছে পাকিস্তানের অর্থনীতি মোটামুটি তখন বেশ দুর্বল অবস্থায়। এই পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাস আক্রমণের পাকিস্তানের জন্য মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে আসে। ধারণা করা হয় এই অতিমারীর কারণে প্রায় ৩০ লাখের উপর মানুষ জীবিকা হারাবে আর আরো ২০ লাখ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে চলে যাবে।

কিন্তু এরপরেও যখন কোভিড আসলো তখন পাকিস্তান তৈরী ছিল পাকিস্তানের দরিদ্র আর অভাবী মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। তাঁর মূল কারণ হলো এতো অনটনের মধ্যেও সামাজিক নিরাপত্তার একটা শক্ত ভিত্তি এর মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে।

লেখার শুরুতেই এটি কিভাবে কাজ করে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে এই অত্যাধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো বিভিন্ন ধরনের তথ্য আর ডেটাবেইজের উপর নির্ভরশীল একটা ব্যবস্থা। এর সাফল্যের মূল কারণ হলো যে এটি দিয়ে খুব সহজে টার্গেট গ্রুপে পৌছে যাওয়া যাচ্ছে, যেটি এমনিতে যাওয়া যেতো না। তথ্যপ্রযুক্তির উপর নির্ভরতার কারণে স্থানীয় প্রশাসনের দুর্নীতি থেকে এটিকে দূরে রাখা সম্ভব হয়েছে।

এহসাস পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ক্যাশ ট্রান্সফারের ঘটনা। গত বছরের নভেম্বরের ৬ তারিখের হিসাব অনুযায়ী পাকিস্তানের দেড় কোটি পরিবারকে ১৭৯ বিলিয়ন রুপী দেয়া হয়েছে।

এহসাস যদিও শুধু কোভিডের সময়ে খ্যাতি লাভ করে কিন্তু এর ব্যাপ্তি আরো অনেক বড়। যে কোন ধরনের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে কাজে এই ব্যবস্থাটি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর মধ্যে তা শুরু হয়েও গেছে।

একই রকম প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়া দেয়া ২০১৯ এর নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার এর উপরে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এই বৃত্তি পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এই বিতরণ প্রক্রিয়া এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পুরোপুরি ডিজিটাল হয়ে গেছে।

পাকিস্তানে প্রথম দিকে এহসাসের বিরুদ্ধচারণ করার মানুষের অভাব ছিলো না। তবে এই ধরনের আচরণ বেশীরভাগই নিরপেক্ষ ছিলো না। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই ব্যবস্থায় দুর্নীতির সুযোগ অনেকাংশেই কমে যাওয়া। পরবর্তীকালে এর বিশাল সাফল্যে এই স্বার্থপর বিরুদ্ধতা খড়কুটোর মতন উড়ে যায়।

পাকিস্তানের প্রসঙ্গ থেকে এখন আসি বাংলাদেশে। বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচী বেশ বিস্তৃত। সেই কর্মসূচীর আওতায় ১৪৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী রয়েছে। তবে এইসব কর্মসূচির কতটুকু কার্যকর দারিদ্র বিমোচনে তা নিয়ে ওয়াকিবহাল মহল অনেক আগে থেকেই ঘোরতর সন্দিহান। এই বছরের শুরুতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মধ্যবর্তী উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে যেই তথ্য উঠে এসেছে তা রীতিমতন ভয়াবহ। এই রিপোর্ট বলছে যে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পুরো আয়োজনে অনিয়মের পরিমাণ ৪৬ শতাংশ। ২০২০-২১ সালে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৫,৫৭৪ কোটি টাকা। এই অনিয়মের মানে হচ্ছে এর অর্ধেক টাকা, মানে হলো প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকাই বিফলে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রমকে আরো কার্যকরী করতে ২০১৩ সালে ধনী-দরিদ্রদের তালিকা তৈরীর প্রকল্প নেয়া হয়। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৩২৮ কোটি টাকা। এটি ২০১৭ সালে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু এ পর্যন্ত এই প্রকল্পের সময় চারবার বাড়ানোর পরেও এখনো শেষ হয়নি। ব্যয় ৩২৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭২৭ কোটি টাকায় ঠেকেছে। প্রকল্পের মেয়াদও বাড়িয়ে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে।

এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এই বিশাল খরুচে প্রকল্প শেষমেষ একটা বিশাল অশ্বাভিষ প্রসব করতে চলেছে। কারণ যেই পদ্ধতিতে ধনী দরিদ্র চিহ্নিত করা হয় সেই পদ্ধতি এই দীর্ঘ সুত্রিতার ফলে প্রায় অকার্যকর হয়ে গেছে বলা চলে।

পরিসংখ্যান ব্যুরো যেই পদ্ধতিতে ধনী দরিদ্র নির্ধারণ করছে তা অনেকটা এরকমঃ জরিপকারীরা বিভিন্ন বাড়ী বাড়ী ঘেয়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা, কক্ষের সংখ্যা, বৈদ্যুতিক সংযোগ, আলাদা রান্নাঘর এবং খাওয়ার ঘর, কি ধরনের ছাদ, টয়লেটের অবস্থা, পানির উৎস, টেলিভিশন বা ফ্রীজ আছে কি না ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছে। যেহেতু বাংলাদেশে একটা বিরাট সংখ্যক পরিবারের আয়ের তথ্য এবং উৎস অজানা থাকে তাই এইসব বৈশিষ্ট্য থেকে অর্থনৈতিক অবস্থা নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়।

এই পদ্ধতির মূল সমস্যা হলো যে পরিবারের এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে। যেমন, পরিবারের কোন এক সদস্য যদি চাকুরী পায় বা বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় তাহলে হয়তো পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই নতুন টেলিভিশন আর ফ্রীজ চলে আসতে পারে। আর সেই হিসেবে ২০১৭ তে নেয়া তথ্য ২০২২ এ এসে কি কাজে লাগবে?

তবে একটা স্বস্তির বিষয় হচ্ছে সরকারও এই বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন আস্তে আস্তে। সরকার একটা ডিজিটালাইজেশন প্রসেসের মধ্য দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তা বোঝা যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে প্রায় ৭৬ লাখ ভাতাভোগীকে ভাতা দেওয়া হবে। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত এমআইএসে অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীদের মধ্যে প্রায় ৪৫ লাখের মোবাইল ব্যাংকিং বা ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

এছাড়াও আরো অনেক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আর তথ্য সস্তার আছে যেগুলো কাজে লাগিয়ে এই সামাজিক

নিরাপত্তাকে দুর্নীতি, অপব্যবহার থেকে মুক্ত করা যায়। মোবাইল কোম্পানী গুলোর কাছে দেশের বেশীরভাগ মানুষের ফোনের ব্যবহার সম্বন্ধে তথ্য আছে যেগুলো থেকে কিছুটা হলেও তাঁর জীবন যাত্রার মান আঁচ করা যায়। সরকারের কাছে সঞ্চয়পত্রের একটি বিশাল ডেটাবেইজ আছে বর্তমানে।

সামাজিক নিরাপত্তায় বর্তমানে একটি শক্তিশালী মতবাদ হলো যে দরিদ্রকে খুঁজে বের করার চেয়ে ধনী ব্যক্তিদের বাদ দেয়ার কাজটি তুলনামূলকভাবে সহজ। কারণ ধনী ব্যক্তিদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর দেয় বা দিতে বাধ্য থাকে এবং তাঁর জীবনযাত্রার মান চিহ্নিত করা তুলনামূলক ভাবে সহজ। পাকিস্তানের এহসাস কার্যক্রমের সাফল্য এখানেই যে এটি সাফল্যের সাথে অবস্থাপন্নদের তালিকা থেকে বাদ দিতে পেরেছে।

করোনার এই সময়টি মানুষের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। বহু মানুষ অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সঠিক উপায়ে এইসব মানুষের পাশে দাঁড়ানো রাষ্ট্রের উচিত। এইক্ষেত্রে পাকিস্তান একটি দারুণ উদাহরণ তৈরী করেছে। বাংলাদেশের বিশৃংখল, দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রমকে শৃংখলায় ফিরিয়ে আনতে এটি একটি কার্যকরী মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে।

ড. রুশাদ ফরিদী,
শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইলঃ rushad.16@gmail.com